আ নো য়া র ই ব রা হি ম

দ্যা এশিয়ান রেনেসাঁস

(এশিয়ার প্রত্যাশিত সমাজ ও রাজনীতির বোঝাপড়া

এবং আগামীর ইশতেহার)

ভাষান্তর : হাবীব কাইউম

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ

গার্ডিয়ান
পা ব লি কে শ ন স

প্রকাশকের কথা

রাষ্ট্র হিসেবে মালয়েশিয়া কতই না ভাগ্যবান! মাহাথির মোহাম্মাদ কিংবা আনোয়ার ইবরাহিমের মতো বিশ্বমানের নেতা পেয়েছে দেশটি এবং তার জনগণ। কোনো ভূখণ্ডে এমন বিশ্বনেতা থাকবে, অথচ তাদের জীবন-মানের কোনো পরিবর্তন হবে না—এমন চিত্রকল্প কখনোই দেখতে পাবেন না। অবশ্যই সে দেশটি ধীরে ধীরে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে বিশ্ববাসীর কাছে উদাহরণ ও লোভনীয় হয়ে উঠবে। মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক এমনটিই হয়েছে।

এই দেখুন না আনোয়ার ইবরাহিমকে। রাষ্ট্রক্ষমতার চূড়ায় না পৌঁছেও যিনি তামাম দুনিয়ায় আলোচিত এক চরিত্র। রাষ্ট্রপ্রধান না হয়েও তিনি যেভাবে আলোর পাদপ্রদীপে এসেছেন, বর্তমান সময়ে এমন রাজনৈতিক চরিত্রকে আপনি খুবই কম দেখতে পাবেন। শুধু মালয়েশিয়ান রাজনীতিতেই নয়; বিশ্ব রাজনীতিতেও এক প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিত্বের নাম আনোয়ার ইবরাহিম। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁর চিন্তা-প্রভাব বেশ অনুঘটক হয়ে উঠছে।

কেন তিনি এমন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন? ‘দ্যা এশিয়ান রেনেসাঁস’ গ্রন্থ পড়লে উপলব্ধি করতে পারবেন—একজন রাজনীতিবিদ কতটা ভিশনারি ও স্বপ্নচারী হলে আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে এশিয়া নিয়ে এমন করে লিখতে পারেন! মালয়েশিয়ার এক রাজনীতিবিদ লিখছেন (তখন তিনি মালয়েশিয়ার অর্থমন্ত্রী) পুরো এশিয়ার রেনেসাঁস (নবজাগরণ) নিয়ে; অথচ তিনি একটি দেশের প্রধান নির্বাহীও নন। আজকের সময়ের তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের ঠিক এই পয়েন্ট-এ বিরাট এক শিক্ষা লুকিয়ে আছে। নেতাকে হতে হয় অনেক বড়ো মনের, বড়ো চিন্তার। নেতৃত্ব মানেই ভিশনারি আর স্বপ্নচারী।

‘দ্যা এশিয়ান রেনেসাঁস’ গ্রন্থ আনোয়ার ইবরাহিমের নিজের লেখা বই। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সেমিনার ও সভায় যেসব লিখিত নোট উপস্থাপন করেছিলেন, সেসবেরই সারাংশ এই গ্রন্থ। চূড়ান্তভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তিনি আরও কিছু সংযুক্তি/বিযুক্তি করেছেন। গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকদের জন্য হয়তো একেবারে সুখপাঠ্য হবে না। রাজনৈতিক কর্মী ও চিন্তকদের বইটির প্রতিটি লাইন ও অনুচ্ছেদ ধরে ধরে পড়তে হবে। প্রথমদিকে একটু কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে আপনি আনোয়ার ইবরাহিমের চিন্তার গভীরে ঢুকে যেতে থাকবেন। তবে বইটি পড়া শেষ হলে নিজেকে অবশ্যই একটা ঋদ্ধ জায়গায় আবিষ্কার করতে পারবেন। এশিয়ার একজন

নাগরিক হিসেবে এই বইটি নতুন ভাবনার খোরাক দেবে আপনাকে। এশিয়ার ভূ-রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বুঝতে বইটি আপনাকে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে।

বইটির অনুবাদ সত্যিই কষ্টসাধ্য এক কাজ ছিল। সম্মানিত অনুবাদকদ্বয় হাবীব কাইউম ও মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ভাই পরম যত্নে কাজটি শেষ করেছেন। গার্ডিয়ানের পক্ষ থেকে অনুবাদকদ্বয় এবং বইটির প্রকাশনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমাদের দেশেও আনোয়ার ইবরাহিমের জন্ম হোক, এমন প্রত্যাশায়...

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০

ভূমিকা

কিছুদিন ধরেই এ বইয়ের আলোচ্য বিষয় আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিগত কয়েক দশক ধরে পূর্ব এশিয়ার উত্থান নিয়ে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগই শুধু অর্থনৈতিক বিপ্লব নিয়ে। এ বিপ্লব লাখো মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং এশিয়ার মধ্যে এমন এক উদ্যম তৈরি করেছে–যা বিশ্ব অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। এমনকী এই বিপ্লবকে বোঝানোর জন্য নতুন একগুচ্ছ শব্দমালাও উদ্ভাবিত হয়েছে। তা হচ্ছে–‘পূর্ব এশীয় অর্থনৈতিক অলৌকিকতা (The East Asian Economic Miracle)।’

বিস্ময়কর এই ঘটনায় পাশ্চাত্যে আবার ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ভয়— লুণ্ঠনকারী এশীয় দঙ্গলের হাতে তাদের সভ্যতা বুঝি ধ্বংসের মুখে পড়ে গেল! এ ভয় তাদের নিজেদেরই আবিষ্কার। এশিয়াকে এভাবে চিত্রিত করার ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কয়েক শতাব্দী ধরে পশ্চিমাদের মন-মানসিকতা আদতে সামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এশিয়াকে দেখার একটা আলাদা চোখ আছে পাশ্চাত্যের। পাশ্চাত্য এখনও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে; এটাই বাস্তবতা।

মূলত এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি একটি আশীর্বাদ। কারণ, এর ফলেই এশিয়া তার আত্মা পুনরাবিষ্কার এবং নিজের সভ্যতা পুনঃসংস্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এই অগ্রগতি অবশ্যই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংলাপকে অপরিহার্য করে তুলবে।

এ বইয়ের মূল আইডিয়া হিসেবে যে কথাগুলো স্থান পেয়েছে, সেগুলো এ অঞ্চলে এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমি আমার বক্তৃতার মধ্যে ব্যাখ্যা করেছি।

বেশিরভাগ চিন্তাই প্রথমবারের মতো পেশ করেছিলাম ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে ওয়াশিংটনের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘Symbiosis between East and West’ শীর্ষক বক্তৃতায়। সেখানে মুসলিম ও খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের উপস্থিতি আমাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সভ্যতা নিয়ে সংলাপের আহ্বান জানানোর সুযোগ করে দেয়। এ ধারণাগুলো এরপর অসংখ্য ফোরামে যেমন : ১৯৯৫ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ইসলাম-কনফুসিয়ানিজম সংলাপ এবং ১৯৯৬’র মে মাসে ফিলিপাইনের অ্যাতিনিও দ্যা ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় পুনরালোচিত হয়েছে।

‘নৈতিকতা ও অর্থনীতি’ এবং ‘মানবিক অর্থনীতি’ রচনা দুটোর সিংহভাগই ১৯৯৬’র জুলাইতে

লন্ডনে অবস্থিত শ্যাটহ্যাম হাউজের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে দেওয়া ভাষণ এবং মালয়েশিয়ার সংসদে দেওয়া বাজেট বক্তৃতাগুলোকে ভিত্তি করে লেখা।

টাইম ম্যাগাজিনের ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি রচনা দিয়ে শুরু 'দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম' নামক অধ্যায়ের। একইভাবে 'ভবিষ্যতের এশিয়া' শিরোনামে সর্বশেষ অধ্যায়টি ফার ইস্টার্ন ইকোনোমিক রিভিউর পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি সংখ্যায় প্রকাশিত আমার রচনার বর্ধিত সংস্করণ। আমার বিভিন্ন বক্তৃতার সম্পাদিত ভাষান্তর *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন* এবং *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এর বিভিন্ন সংস্করণে স্থান পেয়েছে।

'এক এশীয় রেনেসাঁস' নামে প্রথম রচনাটি অবশ্য কোনো বক্তৃতা অথবা পূর্বে প্রকাশিত রচনা নয়। কারণ, এশিয়াকে নিয়ে আমার যে স্বপ্ন, এই মূল গবেষণার উপাত্ত এটাতেই রয়েছে। এর বিষয়বস্তু বহু বক্তৃতা, রচনা এবং এ বইয়ের পুরোটা জুড়ে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

এ বইয়ের ধারণাগুলো বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে ঘটে যাওয়া ব্যক্তিগত ঘটনা, লেখা এবং তর্ক-বিতর্কের প্রতিফলন। কাম্পুং গ্রাম-এ ধর্মীয় আবহে বেড়ে ওঠা, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যানুসারী আচার-আচরণ আমার মধ্যে সাংস্কৃতিকভাবে দৃঢ়মূল হওয়ার একটি গভীর চেতনা গড়ে তোলে। কিন্তু সেই চেতনা ভিন্ন পটভূমি, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভিন্ন বিশ্বাসের লোকদের সাথে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব চালিয়ে যেতে আমার জন্য কোনো রকম বাধার সৃষ্টি করেনি। আমার বাবার বইয়ের যে ক্ষুদ্র সংগ্রহ ছিল, সেখান থেকে এশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, জীবনী এবং মেনসিয়াসের বইগুলো* সেই ছোট্ট বেলায়ই কেমন মনোযোগ সহকারে পড়তাম আর প্রচুর নোট নিতাম; তা আমার এখনও মনে আছে। ১৯৬০ সালে মালয় কলেজ কুয়ালা কাংসারের ইংরেজি গণপাঠশালার সাথে সংযুক্তির ফলে ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য এবং এর বড়ো বড়ো লেখকদের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে সক্ষম হই। অতীতে আমি যুব-আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম বলে বিভিন্ন পটভূমি, সম্প্রদায় আর বিশ্বাসের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পাই। এখান থেকে আমার মধ্যে অন্যদের ব্যাপারে সহনশীলতার একটা মজবুত অনুভূতি গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়; বরং এক সচেতন ও ঐকান্তিক বিশ্বাসও জন্ম নেয়—আমাদের সবাই একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর সে সম্প্রদায় হচ্ছে বিশ্ব মানব সম্প্রদায়।

বিশাল এক সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছি; যেখানে ছাত্র আন্দোলন, ধর্মীয় পুনর্জাগরণ এবং রাজনৈতিক গোলযোগের সাথে বিভিন্ন আইডিয়া ও ঘটনার যুগপৎ উদ্ভব ঘটেছে। এগুলো চেয়ে চেয়ে দেখেই পরিতৃপ্ত থাকার পরিবর্তে আমি একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হতে চেয়েছি। গভীর চিন্তা ও একাকিত্বের জীবন সত্যিই মন-প্রাণকে উজ্জীবিত করতে পারে, তবে কর্ম ও ভ্রাতৃত্ববোধের সাথে গভীর ধ্যান জীবনকে উজ্জীবিত করতে পারে আরও বেশি। সেই পথ না ধরার

* চীনা দার্শনিক মেনসিয়াসকে [৩৭২-২৮৯ খ্রি. পূ.] কনফুসিয়াসের পর দ্বিতীয় মহাজ্ঞানী হিসেবে গণ্য করা হয়। তার আরেক নাম মেংজি।

কারণে আমার কোনো আক্ষেপ নেই। কারণ, যে রাস্তা ধরেছি, তা আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে বারবার এবং বলা যায় পরিতৃপ্তির এক জীবন দিয়েছে। আমি সক্রিয় ও পরিপূর্ণভাবে জীবনের উচ্চ আদর্শ উপলব্ধির কাজে অংশগ্রহণ করে যাব। সে আদর্শগুলো কী, তা এই বই ব্যাখ্যা করবে।

এ বই লেখার পেছনে ডা. মাহাথির মোহাম্মাদের প্রতি আমি বিশেষভাবে ঋণী। তার সহনশীলতা এবং আমার চিন্তা প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার কারণে আমি তার প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ। যারা এ বইটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সহায়তা করেছেন, সেসব বন্ধুকে ও প্রকাশককে ধন্যবাদ দিই, তারা আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে।

অবশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ আমার স্ত্রী ওয়ান আজিজাহ ও আমার সন্তানদের প্রতি—তাদের ভালোবাসা, ধৈর্য ও উপলব্ধির জন্য। তাদের ছাড়া জীবন আনন্দহীন, সুখহীন।

আনোয়ার ইবরাহিম
কুয়ালালামপুর
ডিসেম্বর, ১৯৯৬

অনুবাদকদ্বয়ের কথা

দি এশিয়ান রেনেসাঁসের ব্যাপারে আমার দুটো প্রতিক্রিয়া। প্রথমত, এটি এমন এক বই, যার প্রতিটি লাইন ব্যাখ্যা করার মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর ধরে ক্লাস নেওয়া যাবে শুধু এই একটি বইয়ের ওপর—এটা এমনই সমৃদ্ধ এক বই। দ্বিতীয়ত, একটা দেশ তখনই উন্নতির শিখরে ওঠে, যখন সে বিশ্বমানের নেতা পায়। এ বইটি পড়লে বুঝতে পারবেন, একজন আনোয়ার ইবরাহিমের রাষ্ট্র পরিচালনার, বিশ্ব পরিচালনার প্রতিটি বিষয়ে কী পরিমাণ ধারণা রয়েছে।

পুনশ্চ : বইটা সময় নিয়ে পড়বেন, প্রত্যেকটা লাইন অন্তত দুবার পড়বেন। অনুবাদ সহজ না করতে পারা একান্তই আমার অজ্ঞতা ও অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। মূল বইয়ের শেষে থাকা গ্রন্থপঞ্জি ও বিষয়সূচি অনুবাদে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। পৃষ্ঠার নিচে দেওয়া পাদটীকা অনুবাদকের সংযোজন।

হাবীব কাইউম
f/habib.kaium.bd

সময়োপযোগী, কল্যাণমুখী ও টেকসই উন্নয়নের দর্শন থেকে লেখা আনোয়ার ইবরাহিমের এ বইটি শুধু এশীয়াবাসীকেই সমৃদ্ধ করবে না; বরং বর্তমান পৃথিবীর সকল উন্নয়ন চিন্তক, সমাজচিন্তক, শিক্ষানুরাগী, সর্বোপরি রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ে কাজ করা সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য একটি মডেল হতে পারে। সমকালীন চিন্তা, উন্নয়ন অর্থনীতি, আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়ন, ধর্ম ও আদর্শিক ধারণাগুলোকে সময়োপযোগী করে তুলে ধরা থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যের আগ্রাসী ও নৈতিকতাহীন উন্নয়নের ধ্বংসাত্মক দিকগুলো লেখক দারুণভাবে উপস্থাপন করেছেন।

এ বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রায়োগিক চিন্তার এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। স্পষ্টতই বলতে হয়, আনোয়ার ইবরাহিম এই একবিংশ শতকের একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিক, রাজনীতিক; সর্বোপরি বর্তমান দুনিয়ার প্রচলিত সমস্যাগুলো সমাধানের এক জীবন্ত আলোকবর্তিকা। একজন সচেতন পাঠক হিসেবে বলব—নীতি-নির্ধারণের যেকোনো পর্যায়ের অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের যেকোনো পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের জন্য এ বইটি অধ্যয়ন করা প্রণিধানযোগ্য হতে পারে।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ

সূচিপত্র

এক এশীয় রেনেসাঁস	১৫
প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিথস্ক্রিয়া	৩০
গণতন্ত্র ও সুশীল সমাজ	৪৩
আইন ও ন্যায়বিচার	৫৫
নৈতিকতা ও অর্থনীতি	৬৪
মানবিক অর্থনীতি	৭৪
সংস্কৃতির প্রাধান্য	৮১
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম	৯৬
নতুন ব্যবস্থা	১০৯
তথ্যসূত্র	১২১

এক এশীয় রেনেসাঁস

বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে এশিয়ার উত্থান আকস্মিক ও অসামান্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পঁচিশ বছর আগ পর্যন্তও এশীয় দেশগুলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তারা ছিল পরাশক্তিগুলোর রণক্ষেত্র। আজ দুনিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল যখন হতাশার কালো মেঘের নিচে পরিশ্রম করে যাচ্ছে, এশিয়া তখন আত্মবিশ্বাসের এক নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত।

জাপান আখ্যা পেয়েছে অর্থনৈতিক শক্তির ভারসাম্য হিসেবে। আসিয়ান এবং নতুন শিল্পায়নকারী দেশগুলো (NIC) সমৃদ্ধির জোরে সামনে ধাবিত হওয়া অব্যাহত রেখেছে। নেপোলিয়ন কর্তৃক একদা ঘুমন্ত দৈত্য হিসেবে অভিহিত চীন অবশেষে জেগে উঠেছে। দক্ষিণ এশিয়া ইতোমধ্যেই প্রবৃদ্ধির শোভা গাড়িতে চড়ে বসেছে এবং ইন্দোচীনভুক্ত দেশগুলো নিজেদের অর্থনীতি পুনর্নির্মাণ করছে।

এশিয়ার অর্থনৈতিক উত্থান গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক হলেও এটা এ মহাদেশের আরও গভীর, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পুনর্জাগরণের একটি দিক মাত্র। সেটার নাম দেওয়া যেতে পারে এশীয় রেনেসাঁস। এশীয় রেনেসাঁস বলতে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি—

১. চিরায়ত মডেলের প্রভাবে শিল্প ও বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ; যার ভিত্তি হচ্ছে শক্তিশালী নৈতিকতা ও ধর্ম।

২. একটি সাংস্কৃতিক পুনরুত্থান, যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পুনঃপ্রস্ফুটনশীল শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য-সংগীত এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি।

চতুর্দশ থেকে ষোড়োশ শতাব্দীর মধ্যে সংঘটিত হয় ইউরোপীয় (ফ্লোরেন্টাইন) রেনেসাঁস। এর ভিত্তিপ্রস্তর ছিল–'বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার লাভ এবং নৈতিকতা থেকে মুক্তি।' এতে ছিল নিজের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ব্যক্তির শক্তি লাভের তীব্র দাবি। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অতি ধার্মিকতার দুষ্টামি ছিল। ফলে এ দাবি রেনেসাঁসকে ঠেলে দেয় সেক্যুলার মানবতন্ত্রের বিকাশের দিকে। উইল ডুরান্ট যেমনটা লিখেছেন–

> 'ব্যক্তিমানসের বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার লাভ নৈতিকতার আধ্যাত্মিক বিধিনিষেধকে দুর্বল করে দিলো। সেগুলোকে কার্যকরভাবে প্রতিস্থাপিত করার মতো অন্য কিছু পাওয়া গেল না। ফলাফলটা ছিল বিধিনিষেধসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার এমন এক মুক্তি, অনৈতিকতার এমন এক উচ্ছল প্রাচুর্য, যা ইতিহাসের অজানা। কারণ, কূটতার্কিকেরা পুরাণকে করেছিল চুরমার, মনকে করেছিল অবাধ, প্রাচীন গ্রিসের ন্যায়-নীতিকে করেছিল শিথিল।'[i]

ইউরোপের সাথে এশিয়ার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। এ সাদৃশ্য বিনিময় করার বেলায় ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে এশীয় রেনেসাঁসের মৌলিকভাবেই পার্থক্য দাঁড়িয়ে যায়। কারণ, এশীয় রেনেসাঁসের ভিত্তি প্রোথিত রয়েছে ধর্ম ও ঐতিহ্যে। এখানকার প্রধান ধর্ম ও ঐতিহ্য হিসেবে রয়েছে ইসলাম, কনফুসিয়াজম, বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিষ্টান।

মানুষের ব্যাপারে প্রমিথিউসের ধারণা আবিষ্কার করতে গিয়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁস-চিন্তা প্রাচীন রূপকথাকে নতুনভাবে চালু করেছে। যে প্রমিথিউসকে স্বর্গের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তাকে নেতিবাচকভাবে না দেখে বরং ধর্মতত্ত্ব এবং প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে স্বাধীন এক সত্তা হিসেবে লালন করা হয়। ইসলামের ধারণা হচ্ছে, মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফাতুল্লাহি ফিল আরদ)। আর কনফুসীয় ধারণায় মানুষকে বলা হয় 'জেন'।* প্রমিথিউসকে ঘিরে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের দর্শন শুধু যে এসব ধারণার বিরোধিতা করে তা-ই নয়; বরং মানুষের ব্যাপারে খ্রিষ্টীয় ধারণা ইমাগো দেই (খোদার প্রতিকৃতি) কিংবা পন্টিফেক্স** তথা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী ধারণারও বিরোধিতা করে।[ii] বিশ্বাসের যুগে মানুষের পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শক্তিশালী। কিন্তু এই নতুন চিন্তাধারার ফলে পাশ্চাত্য সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করে। এ প্রক্রিয়া আলোকপ্রাপ্তি [Enlightenment]-এর পর গতিলাভ করে। অন্যদিকে পরিবর্তন ও রূপান্তরের কয়েক শতাব্দী পার করেও এশিয়া তার আবশ্যিক ধর্মীয় চরিত্র ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। একজন এশীয় বাস্তবে একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ (Persona Religiosus)।

আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্তির তাড়নায় ইউরোপীয় রেনেসাঁস হয়ে দাঁড়ায় সংগঠিত নিয়ন্ত্রণের জুলুমবাজি থেকে মনকে স্বাধীন করার একটি আন্দোলন। সেইসঙ্গে এটি হয়ে উঠে নৈরাজ্য ও বস্তুবাদী সংস্কৃতি মেনে নেওয়ার অজুহাত। কিন্তু এশিয়ার রেনেসাঁস উৎকর্ষের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে এশীয় সমাজগুলোর প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও বিকাশকে আবশ্যিক করে দেয়। এগুলো সত্য ও শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা, ন্যায়বিচার ও সমবেদনা, পারস্পরিক সম্মান ও আত্মসংযম এবং দায়িত্বশীলতার সাথে স্বাধীনতা দিয়ে অনুপ্রাণিত সমাজ। বিশ্বাস ও ধর্মীয় চর্চা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সম্প্রদায়ের জীবনে প্রবাহিত হয়। অন্য যেকোনো সামাজিক শক্তির তুলনায় ধর্মই এশিয়াকে একটি বিপুল বৈচিত্র্যের মহাদেশ বানিয়েছে। এভাবে বিশ্বাসের নবায়ন এবং বহু সংস্কৃতির নিশ্চয়তা এশীয় রেনেসাঁসের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এশীয় রেনেসাঁসের এই চেতনাকে বাস্তবে রূপদান করতে গিয়ে কবি-দার্শনিক আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) লিখেছেন–

'যেন আমি পারি

---

* কনফুসীয় দর্শনে 'জেন' বলতে মনুষ্যত্ব বোঝানো হয়।

** ল্যাটিন ভাষায় পন্ট অর্থ সংযোগ এবং ফেক্স অর্থ তৈরি করা। সুতরাং পন্টিফেক্স অর্থ সংযোগ সৃষ্টিকারী। পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস ছিল প্রাচীন রোমের সর্বোচ্চ ধর্মীয় পদ।

ফিরিয়ে আনতে মুসাফিরকে তার আপন গৃহে,
অলসতায় বুঁদ হয়ে থাকাদের মাঝে আনতে পারি
অশান্ত ব্যাকুলতা;
যেন এগিয়ে যেতে পারি উৎসাহের সাথে
নতুনের সন্ধানে—
আর পরিচিত হতে পারি
নতুনের অগ্রদূতরূপে।’[iii]

এশীয় রেনেসাঁসের নতুন পরিস্ফুটন যেহেতু মাত্রই দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করেছে, তাই একে সফল করতে চাইলে এর লালন প্রক্রিয়া ধরে রাখতে হবে। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার কারণে কাজটা আরও অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হিসেবে হাজির হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা বর্তমানের চেয়ে আরও জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। নতুন সহস্রাব্দের ভয়ানক বিপদগুলো আমরা কেবল নির্দেশনা ও প্রত্যয়ের স্পষ্ট ধারণার মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারি।

সন্দেহ নেই, বিষয়টি মোটেও সহজ নয়। কিন্তু এ বিষয়ে বর্তমান বিতর্ক ভুল বোঝাবুঝি আর পূর্বসংস্কারের পাঁকে আটকে পড়েছে। এর একদিক এশিয়ায় ব্যাপক চুনকাম করছে, আরেক দিক অনবরত তাচ্ছিল্য করছে। এটা শুধু পশ্চিমের দোষগুলোর বিরুদ্ধে এশিয়ার গুণগুলোকে দাঁড় করানোর বিষয় নয়।

উগ্র দেশপ্রেমের প্রলোভন

মন যা চায়, কল্পনায় যা আসে, রুচিতে যা ধরে—এরই ভিত্তিতে সৃজনশীল বস্তু সৃষ্টি এবং উপভোগের বাইরে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বহুমুখী বৈশিষ্ট্য দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছে। সে সময় পুরো সমাজ ছিল রূপান্তরের মধ্যে। তার মূল্যবোধ, অভিরুচি, সামাজিক আচার-আচরণ, ব্যক্তি এবং সম্মিলিত ভাগ্যের কল্পনাশক্তি, ধর্ম ও নৈতিকতার ব্যাপারে মনোভাব—সবই বদলাচ্ছিল। অধিকন্তু এটা ছিল ‘শিল্পরাষ্ট্র’র উত্থান। কূটনৈতিক শিল্প, যুদ্ধের কৌশল ও দেশপ্রেম জন্ম নেয় এ পর্যায়ে।[iv] একইভাবে এশিয়ার রেনেসাঁস হচ্ছে এর সংস্কৃতি এবং সমাজগুলোর আটলান্টিক শক্তিসমূহের নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে আত্মবিশ্বাসের দিকে রূপান্তর এবং নতুন সহস্রাব্দের সূর্যোদয়ে নতুন করে ফুটে ওঠা। ‘মহারোহণ’-এর সাথে সাথে এখানকার জনগণের জীবনযাত্রার মানে যে বিপ্লব এসেছে, সেগুলোকে শক্তিশালী করার সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান দিক হচ্ছে ব্যস্তসমস্ত বাণিজ্য আর গতিময় শিল্পসমূহ।

যে যুগে অর্থনৈতিক শক্তির তুলনায় সামরিক শক্তির গুরুত্ব বেশি, সেখানে এশিয়ার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ

হতে পারে না। ব্যক্তি মানবের মর্যাদা ও পবিত্রতার ধারণার এক পুনরাবিষ্কার নাগরিক সমাজ এবং মানবিক শাসনের প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল করবে। এশীয় এবং অন্যান্য মানবজাতির ঐতিহ্যের মূলে এ ধারণাই প্রোথিত। এদের মধ্যে এশিয়া হয়তো বিশাল অর্থে তার দার্শনিকদের মানসজীবন এবং শিল্পীদের সৃজনশীল শ্রমের ফলে সমৃদ্ধ হবে।

অনেকগুলো মহান সভ্যতাকে লালন করার কারণে এশিয়াকে বলা যেতে পারে একশিলা (Monolithic)। এশীয় রেনেসাঁসকে অবশ্যই সাংস্কৃতিক দিক থেকে উগ্র দেশপ্রেমের পক্ষপাতী হওয়া চলবে না; বরং থাকতে হবে সাংস্কৃতিক পুনর্জন্ম এবং ক্ষমতায়নের পক্ষে। উগ্র দেশপ্রেম অন্যদের ওপর নিজের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের একটা ধারণা পোষণ করে। এর নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে, অন্যরা সভ্য হলেও সামান্য পরিমাণ সভ্য। এর শাখা-প্রশাখা হচ্ছে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ।

যদি উগ্র দেশপ্রেমের শিখা বিস্তৃতির সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তা এক পর্যায়ে এশীয়দেরই গ্রাস করতে শুরু করবে। যে বাতাসের সূত্রপাত করে, সে ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হবে। এটা কোনো আনুমানিক কথা নয়; বরং পুরোদস্তুর বাস্তবতা। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আজও এশিয়ার বহু জাতি নিজেদের সীমানার মধ্যে ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক এবং উপজাতীয় শত্রুতা লালন করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অনেক উন্নয়নশীল সমাজে স্বজাতপ্রিয় প্রবণতা এখনও বর্তমান। বিষয়টাকে প্রায়ই শিল্প ও সাহিত্যকর্মে বিশাল সৌন্দর্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। দ্রুততর পরিবর্তনের প্রলেপ দিয়ে যারা নতুন পরিস্থিতির সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে অক্ষম, তারা প্রায়ই নিজেদের নৃতাত্ত্বিক রেশম-গুটির মধ্যে ঢুকে যায়। এসব ভাব-বিলাসিতার ভূত সংকীর্ণ ও উপজাতীয় রাজনৈতিক শক্তিতে সমবেত হওয়ার কারণে বর্তমানে তা অদম্য।

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়—বলকান অঞ্চলে, বিশেষত সার্বদের মধ্যে এবং রুয়ান্ডার হুতু-তুৎসিদের মধ্যে চরম নৃতাত্ত্বিক ও আদিম উদ্দীপনার ধ্বংসাত্মক ফলাফল পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। নতুন শতাব্দীতে এশীয়দের এই বিপদ যেকোনো মূল্যে এড়াতে হবে। আর তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মিল রয়েছে এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে কোন বিষয়টাকে তারা বৈশ্বিক করে তুলতে পারে—এ সবের ওপর ভিত্তি করে এক নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খতাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি ভাবতে হবে।

---

i Durant, Will, *The Story of Civilization Vol. 5: The Renaissance,* New York: MJF Books, 1953, p. 567.

ii Nasr, Seyyed Hossein, *Religion and the Order of Nature,* New York: Oxford University Press, 1996, Chapter 5.

iii lqbal, Muhammad, *The Secrets of the Self,* translation and notes by R.A. Nicholson, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1972. [বাংলা অনুবাদ : সৈয়দ আবদুল মান্নান]

iv See Burckhardt, Jacob, *The Civilization of the Renaissance in Italy,* New York: Random House, 1954, p. 4